International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS)
A Peer-Reviewed Monthly Research Journal
ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print)
Volume-II, Issue-III, April 2016, Page No. 1-6
Published by: Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.irjims.com

গণদেবতা উপন্যাসে আধুনিক ঐতিহাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

সেখ আহাসান কেরিম
গবেষক, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ভারত

Abstract

In his novel Ganadevata Tarasankar Bandyopadhyay denotes Ganadevata as a social institution. Hare he describes how a personal life was transformed into a community life centering a social institution. 'Chandimandap', afterwards the community life and agrarian economy were dislocated due to the emergence of the industrial economy and new social institution in the first half of the twentieth century in Bengal. From this perspective, Tarasankar Bandyopadhyay's Ganadevata may be regarded as the discourse of social, economical, cultural and political past of Bengal people. Here, Gonadevata is a social, economical, cultural and political memory. It is the memory of rural life collected by the author. As the author was an inhabitant of Birbhum. So he vividly describes the rural life of Birbhum. The core element of this novel is the social theory based on the economy. He described how the self-sufficient village economy was destroyed and new towns were build up in the period 1920-1930 A.D. Zamindari system deprived the general people. The new middle-class people emerged and cast system was also transformed with the spread of commercialization and dislocation of the rural economy. In this novel, Tarasankar Bandyopadhyay described the environmental condition of rural Bengal. Besides, he believed that social system will be changed through the revolution of general people. Describing the general people as God Tarasankar Bandyopadhyay opens up a new aspect of historical writing.

Therefore, Tarasankar Bandyopadhyay can be regarded as a writer endowed with the history-conscious thinker. He did not enter into the womb of ancient history. He recorded the contemporary history of his time. From this perspective he was not only a novelist but also a historian.

Key Words: Subaltern, Health and Hygiene, Historiography, Insurgency, Commercialization.

সাহিত্যিক-ঐতিহাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনার মূল্যায়ন যে ভাবেই হোক না কেন, স্মরণ রাখতে হবে ইতিহাস নির্ভর সাহিত্যে তাঁর স্থান বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরেই। তবে এ বিচার সাহিত্য সমালোচকদের বিচারে নয়, এ বিচার পাঠকের বিচার, আর সেইজন্য এই বিচার যথার্থ। বলা বাহুল্য তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনার যোগ্যতম বিচারক হল একালের এবং অনাগতকালের রসিক পাঠক। "তার সাহিত্যের দুই প্রধান উপজীব্য- মাটি আর মানুষ"[১] মাটির প্রতি মমত্ববোধ এবং মানুষের মহিমা প্রচার তাঁর সাহিত্য রচনার প্রধান অনুভূতি ও উপলব্ধি। আর এই সামগ্রিক অনুভূতি ও উপলব্ধির মূলে আছে গভীর মানব প্রেম।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১) তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে ৭৫টির বেশি উপন্যাস রচনা করেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- 'দীনার দান'(প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস) 'চৈতালী ঘূর্ণী', 'নীলকণ্ঠ', 'ধাত্রীদেবতা', 'সন্দীপন পাঠশালা', 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা', 'আরোগ্য নিকেতন', 'কালান্তর', 'যতিভঙ্গ', 'উত্তরায়ণ', 'ভূবনপুরের হাট', 'কালরাত্রি', 'ব্যর্থ নায়িকা', 'সপ্তপদী', 'নাগিনী কন্যার কাহিনী', 'গণদেবতা' ইত্যাদি।

'গণদেবতা' উপন্যাসটি "বিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধের বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্যেরই একটা যুগ-পরিচায়ক উপন্যাস।"[২] এই সুবৃহৎ উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় 'চণ্ডীমণ্ডপ' নামে ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাস থেকে ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাস সময়কালে প্রকাশিত হয়েছিল। "১৩৪৯ বঙ্গাব্দের ২০শে কার্ত্তিক গণদেবতা (চণ্ডীমণ্ডপ) নামাঙ্কিত হয়ে শক্তিরঞ্জন সোম কর্তৃক গ্রন্থাগারে প্রকাশিত হয়।"[৩] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রত্যক্ষ অনুভূতির মাধ্যমে 'গণদেবতা' উপন্যাসটি রূপায়িত হয়েছে। তিনি গণদেবতা (চণ্ডীমণ্ডপ) উপন্যাসটিকে উৎসর্গ করেছিলেন সরোজ কুমার রায় চৌধুরী মহাশয়কে। উল্লেখ্য গণদেবতা উপন্যাসের পরবর্তী 'পঞ্চগ্রাম' অংশটি ১৩৫০ বঙ্গাব্দে মূল উপন্যাসের সহিত যুক্ত হয়ে ক্যাতায়নী বুক স্টল থেকে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটি নতুন সংস্করণ প্রকাশনার সময় লেখক প্রয়োজন মতো পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করেছিলেন। সমগ্র 'গণদেবতা' উপন্যাসটিকে লেখক উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর পরম শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

সুতরাং, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাপঞ্জিতে 'গণদেবতা' ও 'পঞ্চগ্রাম' নামে দুটি উপন্যাস পাওয়া যায়। আসলে "গণদেবতা ও পঞ্চগ্রাম, একটি উপন্যাসের দুটো খণ্ড"[৪] একটি 'চণ্ডীমণ্ডপ' অন্যটি 'পঞ্চগ্রাম', এই দুই অংশের সাধারণ নাম 'গণদেবতা'। যদিও চণ্ডীমণ্ডপের নামকরণ করা হয়েছে গণদেবতা, তথাপি গণদেবতা অংশের নয় সমগ্রের নাম। এই সমগ্র অংশের মধ্যে লেখকের পরিকল্পিত গণদেবতার যথার্থ রূপ উদ্ভাসিত। উল্লেখ্য 'গণদেবতা উপন্যাসে আধুনিক ঐতিহাসিক তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়' আলোচনার পরিধি চণ্ডীমণ্ডপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

গণদেবতা উপন্যাসে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কালান্তরের এক নতুন দেবতাকে আবাহন করেছেন। 'গণদেবতা'য় পৌরাণিক কোন দেবতা নেই, আছে- অনিরুদ্ধ, গিরীশ, পদ্ম, দুর্গা, পাতু, শ্রীহরি, দেবু, যতীন, জগন, সতীশ, বিলু প্রমুখ, এরা কেউই দেবতা নয়, এরা মানুষ। এরা আত্মকেন্দ্রিক একক মানুষ নয়, গোষ্ঠীকেন্দ্রীক সামাজিক মানুষ। এই গোষ্ঠীজীবনের গণ-শক্তিতে যে দেবতার রথের চাকা চলে তাহাই গণদেবতা। চণ্ডীমণ্ডপ এই গণদেবতার বিগ্রহ। তাই সমকালীন যে কোন সমস্যার সমাধানের জন্য তারা চণ্ডীমণ্ডপের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং চণ্ডীমণ্ডপের কাঠামো বর্তমান পঞ্চায়েতব্যবস্থাকে প্রভাবিত করেছে। এদিক দিয়ে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গণদেবতা' পুরানো হয়েও আধুনিক, আর তাঁর চিন্তাভাবনা এক দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ঐতিহাসিকের মতো।

ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনকালে মেটকাফ, এলফিন স্টোন, মেইন, মুনরো, ফ্রান্সিস, শোর প্রমুখ ইংরেজ বুদ্ধিজীবি ও আমলারা ছিলেন ভারতের প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থা ব্যাখ্যার পথিকৃৎ। এঁরা প্রত্যেকেই ভারতে গ্রামীণ সমাজের অস্তিত্বকে স্বীকার করেছেন। মুলত এঁরা "সবাই মনে করতেন এই গ্রামীণ সমাজ ছিল বিচ্ছিন্ন এবং স্বয়ং সম্পূর্ণ"[৫] গণদেবতা উপন্যাসের সূচনায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় স্বদেশ জীবনের যে চিত্র এঁকেছেন সেটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থনীতি, যে অর্থনীতির উপর সমগ্র সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল। এর পাশাপাশি তিনি গ্রামীণ সমাজের স্বাতন্ত্রতা, জজমানি প্রথা ইত্যাদির কথা তুলে ধরে পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকদের গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছেন। অতএব তাঁর চিন্তাভাবনা সাহিত্যিক হয়েও ঐতিহাসিক।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 'গণদেবতা' উপন্যাসে ১৯২০ এর দশকের বীরভূমের গণ জীবনের সার্বিক চিত্র এঁকেছেন, তা ঔপনৈবেশিক ভারতের প্রতিটি গ্রামেরই প্রতিচ্ছবি। এখানে তিনি দেখিয়েছেন- চিরাচরিত গ্রামীণ ব্যবস্থার ভাঙন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি, গ্রামীণ মানুষের জীবন ও জীবিকার পরিবর্তন, আধুনিক শিল্পায়ন, নগরায়ন, কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ, অসহনীয় কর বৃদ্ধি এবং তা আদায়ের নির্মম মানসিকতা, উত্তেজনাহীন পল্লীজীবন, কর্মহীন মনুষ্য সম্প্রদায়, দারিদ্র্যতা, বেকারত্ব, অসহায়তা, জীর্ন শীর্ন ঘর, রিক্ত অঙ্গন, অভাব ক্লিষ্ট মানুষের মুখ, মহামারী, ম্যালেরিয়া, ঋণভার, শীর্নকায় অর্ধউলঙ্গ অজ্ঞ শিশুর দল, সমাজ ও শৃঙ্খলার ভাঙন, নব্যজমিদার শ্রেণীর উৎপত্তি এবং জমিদার-মহাজনদের অন্যায় অত্যাচার ব্যাভিচার ও শোষন, পুলিশ প্রশাসনের নৈতিক অবক্ষয়, দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া সর্বহারা শ্রেণির প্রতিবাদ। এই সবকিছুকে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় গণদেবতায় স্থান দিয়ে একজন অর্থনৈতিক ঐতিহাসিকের দায়িত্ব পালন করেছেন। এর মাধ্যমে লেখক "গ্রামীণ জীবনের যে হতাশার ছবি তুলে ধরেছেন তাকে সমর্থন করছে ইতিহাস রচনার নানা প্রামান্য উপাদান"[৬]

গণদেবতা অধ্যয়নে মনে হয় অনিরুদ্ধ, গিরীশ ও পাতুর মনে যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছিল তা থেকে বিদ্রোহের সৃষ্টি হতে পারত, এবং এই বিদ্রোহ হলে তা হত উচ্চবিত্ত শ্রেণীর বিরুদ্ধে কামার, ছুতোর, মুচি, নাপিতের বিদ্রোহ। অর্থাৎ পুঁজিবাদের

বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর বিদ্রোহ। আর এই বিদ্রোহ ঘটলে সেটি হত উপন্যাসের কেন্দ্রীয় ঘটনা। সেক্ষেত্রে উপন্যাসের নায়ক হতেন অনিরুদ্ধ কর্মকার। কিন্তু তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তা করেননি। কারণ, 'গণদেবতা' একনায়কত্বের উপন্যাস নয় ইহা বহুনায়কত্বের উপন্যাস। এককথায় বলা যায় সমগ্র গণবিপ্লবের মধ্যে দিয়ে সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটবে একথা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্বাস করতেন। তাঁর এই চিন্তাভাবনা অবশ্যই একজন মার্কসীয় ঐতিহাসিকের চিন্তাভাবনা।

ফ্রান্সের আনাল গোষ্ঠীর ঐতিহাসিক ফার্দিনান্দ ব্রুদেল ও মার্কব্লখ অতীত সমাজের জীবন অনুসন্ধানে খাদ্যভাসের গুরুত্ব তুলে ধরেছিলেন। ফ্রান্সের সমাজ ও সংস্কৃতিতে খাদ্যের তাৎপর্য উপলব্ধি করেছিলেন। একটি খাদ্যপন্য কীভাবে ইতিহাসের গতিকে প্রভাবিত করে তার প্রমাণ মেলে সিডনি মিনজ রচিত sweetness and power : The place of Sugar in Modern History গ্রন্থে। অনুরূপ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গণদেবতা উপন্যাসে গ্রাম্য মানুষের খাদ্যাভাস আলোচনা করে ইতিহাসের গতিকে প্রভাবিত করেছেন- তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়- "ঘরদুয়ার পরিস্কারের পর আহার্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে। গত সন্ধ্যার বাসিভাতই ইহাদের সকলের খাদ্য ছোটছেলেদের মুড়ি দেওয়া হয়; কিন্তু ভাত বা মুড়ি সবই নস্ট হইয়া গিয়াছে।"[৭]

উপন্যাসে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন ও আইন অমান্য আন্দোলনের রাজনৈতিক দিকটি আলোচিত হয়েছে। এই আলোচনায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিহাসের বিষয়কে সরাসরি উপন্যাসের মৌলউপাদান রূপে ব্যবহার করেছেন। দেবু ঘোষ ১৫ মাস কারাবাসের পর মুক্তি লাভ করেছে উপন্যাসের এই অংশের রূপায়নে লেখক তাঁর নিজের জীবনের রাজনৈতিক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ার ঘটনার অভিজ্ঞতার সাহায্য নিয়েছেন। কারণ এই সময়ে তিনি অসহযোগ আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে কারারুদ্ধ হন। আবার যতীন চরিত্রটির মধ্যে সমকালীন রাজনৈতিক চিন্তাধারার ছবি পাওয়া যায়। ১৯২৪ খ্রিঃ বিশেষ ক্ষমতাবলে ইংরেজ সরকার 'আটক আইন' প্রবর্তন করে। এই আটক আইনে বন্দীযুবক যতীন। সে বিপ্লবী কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাচীন প্রচলিত চিন্তাধারায় বিশ্বাসী। শিবকালীপুরে তাঁর অস্থায়ী বসবাস হলেও এই গ্রামের প্রতি তাঁর মমত্ববোধ গভীর। কারণ এখানকার মানুষের শিক্ষা না থাকলেও একটা প্রাচীন জীর্ন সংস্কৃতি আছে। এই প্রচলিত মূল্যবোধ সমৃদ্ধ জীবনধারা ধ্বংসে সে বিক্ষুব্ধ। যতীন স্বদেশকে ভালোবাসে এবং স্বদেশের উন্নতি চাই, কিন্তু প্রাচীন ঐতিহ্যকে ধ্বংস করে নয়। যতীন যতটা না বিপ্লবী তার থেকে বেশি সমাজসেবী ও হৃদয়বান পুরুষ হিসাবে লেখক তাঁকে তুলে ধরেছেন। কারণ উপন্যাসের নাম গণদেবতা। এখানে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্যিকের পাশাপাশি ঐতিহাসিকের ভূমিকা যথাযতভাবে পালন করেছেন। লেখকের এই পর্বের আলোচনা পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকদের কাছে মুখ্য উপাদান (Primary source) এর ভূমিকা পালন করেছে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় গণদেবতা উপন্যাসে স্বদেশ প্রেম ও স্বাদেশিকতার এক নব দিগন্ত উন্মোচন করেছেন। দেবুর জাতীয়তাবাদী চিন্তাভাবনা ও চণ্ডীমণ্ডপের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা তাঁর অমলিন দেশপ্রেমেরই সামিল। অন্যদিকে অনিরুদ্ধ ও পাতু অন্ন-রোজগারের খোঁজে শহরে চলে গিয়ে পুনরায় গ্রামে ফিরে আসা। তাদের গ্রামের প্রতি গভীর মমত্ববোধের পরিচয় বহন করে। এর পাশাপাশি বিদেশী শাসকের অত্যাচার থেকে দেবু, জগন, যতীনদের বাঁচানোর জন্য দুর্গার সাপে কামড়ানোর অভিনয় অথবা দেবু, অনিরুদ্ধের জেল যাত্রা। এক নব্য জাতীয়তাবাদী চিন্তাভাবনার বর্হিপ্রকাশ। আবার এই পর্বে বংশানুক্রমিক বেগার শ্রমের বিরোধিতা করা, প্রজাস্বত্ব আইন পরিবর্তনের মানসিকতা, স্বরাজ-ভাবনা ও জাতীয় কংগ্রেসের রাজনীতির বিভিন্নদিক, বাংলাদেশের গ্রামীণ জনসংগঠন ও প্রজাসমিতির উত্থান, মহাজনী কারবারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, সর্বোপরী সর্বহারা বাঙালী জাতির মুক্তকামী মানসিকতার চিত্র অঙ্কনের মাধ্যমে জাতীয় রাজনীতির এক বৃহত্তর প্রেক্ষাপট লেখক আধুনিক ঐতিহাসিকদের নিকট উদ্ভাসিত করেছেন।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের যোগ মাটি ও মানুষের সঙ্গে। বাংলাদেশের মাটি ও মানুষের সঙ্গে তার কোন ভিন্নতা ছিলনা। তাঁর সাহিত্যের সম্পদ নিজের চোখে দেখা সত্য, নিজের অন্তরে উপলব্ধ সত্য। এই বিচারে তাঁর সাহিত্য রচনার মূল লক্ষ্য প্রত্যক্ষ সত্যকে সাহিত্যের সত্যে পরিণত করার ইতিহাস। সেই জন্য যে বিশেষ অঞ্চলের মাটি-মানুষের সঙ্গে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের একাত্মতা সেই অঞ্চলের মাটি-মানুষ তাঁর রচনায় প্রাধান্য পেয়েছে। তাই আধুনিক সাহিত্যিক সমালোচকরা তাঁর রচনাকে আঞ্চলিক রচনা হিসাবে চিহ্নিত করেছেন, স্থূল বিচারে সব সাহিত্যিক আঞ্চলিক, তবে সূক্ষ্ম বিচারে কোন সাহিত্যই আঞ্চলিক নয়। সব রচনায় আঞ্চলিকতার ফ্রেমে বাঁধা হয়ে এমন সত্যকে উৎঘাটিত করে যে সত্য অঞ্চল বিশেষের নয়, সর্বদেশের সত্য। আঞ্চলিক জীবনের চাবিকাটি নিয়ে গণদেবতায় লেখক উন্মুক্ত করেছেন এক সর্বব্যাপি সুদূরপ্রসারী

চিরন্তন জীবন। এখানেই আছে একজন ঐতিহাসিক হিসাবে, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠত্ব। কারণ সাহিত্যের মধ্যে তিনি জীবনের স্পন্দন খুঁজেছেন, জীবনকে ভালোবেসেছেন, জীবনের সন্ধান করেছেন। এপ্রসঙ্গে ঐতিহাসিকের দায়িত্ব প্রসঙ্গে হেনরী পিরেন বলেছেন- "আমি পুরাতত্ত্ববিদ নই, পুরাতাত্ত্বিক উপাদান খুঁজে বেড়াই না। আমি ঐতিহাসিক, জীবনের সন্ধান করি, জীবনকে ভালোবাসি"[৮]

গণদেবতা উপন্যাসে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় দুর্গা ও পদ্মের চরিত্র অঙ্কনে একজন প্রকৃত নারীবাদী ঐতিহাসিক হিসাবে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁর লেখনীতে দুর্গা এক ব্যক্তিত্বময়ী নারী সে স্বাধীনচেতা, বীরঙ্গনা, দায়িত্ব ও কর্তব্যপরায়ণা, সমাজসেবী, সমাজের চালিকাশক্তি। ব্রিটিশ প্রশাসন থেকে শ্রীহরি, পাতু, অনিরুদ্ধ তাঁর অঙ্গুলিহেলনে চলে। প্রবল তেজস্বিনী নিজের যোগ্যতা ও দক্ষতায় অন্যকে সে আপন করে নেয়। লেখকের ভাষায়- "দুর্গা তুষানল ও মরিচিকা দুই-ই, সে পাষানী, বিশ্বাস ঘাতিনী, মায়াবিনী"[৯] এর পাশাপাশি অনিরুদ্ধের অবর্তমানে পদ্ম যেভাবে সাংসারিক দায়িত্ব পালন করেছে, যতীনের সেবা-যত্ন করেছে এবং উচ্চিংড়ে ও গোবরাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে, সর্বোপরী চণ্ডীমণ্ডপে পুজা দিতে গিয়ে যে চরম ঔর্দ্ধতের পরিচয় দিয়েছে, তা দেখে মনে হয় দুর্গা ও পদ্মা দুজনেই পুর্ণ প্রকাশিত উদ্ভাসিত প্রবল ব্যক্তিত্বময়ী নারী।

গণদেবতা'য় লেখক দেখিয়েছেন সাম্রাজ্যবাদী বিষচক্ষু কিভাবে নিম্নবর্গের মানুষ অর্থাৎ কামার, ছুতোর, মুচি, নাপিত, অস্পৃশ্য, সর্বহারা শ্রেণীর উপর নিক্ষিপ্ত হয়েছে। উদাহরণ প্রসঙ্গে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় দুর্গাপুরের স্বনামধন্য ত্রিপুরা সিং এর কথা বলেছেন। নিম্নবর্গ মানুষের অসহায়তা, দারিদ্র্যতা, অভাব অনটন, পল্লীজীবনের দুঃখ কান্নার মর্মস্পর্শী ব্যাখ্যার মধ্যে দিয়ে জনগণকে দেবতা করে নিম্নবর্গের (Subaltern) ঐতিহাসিকদের পথকে অনেক আগেই প্রশস্থ করেছেন। বিপ্লবের সময় নিম্নবর্গ ঐক্যবদ্ধ হয়। "সেই প্রতিবাদের চূড়ান্ত, সর্বাঙ্গীন, সনাতন ও সার্বত্রিক রূপ কৃষক বিদ্রোহ"[১০] সেটি গণদেবতা উপন্যাসে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমাণ করে ইতিহাস নামক বিদ্যাশৃঙ্খলার অনেক আগেই নব রূপান্তর ঘটিয়েছেন। উদাহরণ প্রসঙ্গে বলা যায় অনিরুদ্ধের শ্রীহরির বাগান নষ্ট করার অকপট স্বীকারোক্তি জমিদারতন্ত্রের বিরুদ্ধে নিম্নবর্গের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ।

"গণদেবতা উপন্যাসটি একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের একটি নির্দিষ্ট সময়কালের কাহিনী"[১১] এই উপন্যাসে আলোচিত হয়েছে গ্রামীণ বাংলার লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন দিল। ঘেঁটু গান, বাউলগান, কবিগান ইত্যাদির মাধ্যমে সেই যুগের গ্রামীণ বাংলার ঐতিহাসিক চরিত্র ধরা পড়েছে। এর পাশাপাশি গ্রামীণ বাংলার বারমাস্যা বর্ণনার মাধ্যমে গণদেবতা এক জীবন্ত দলিলে পরিণত হয়েছে। আবার এই উপন্যাসের মাধ্যমে লেখক বাংলার পুজা পার্বণ, শিক্ষা, ধর্ম, দেবদেবী (লক্ষী, অন্নপূর্ণা, দুর্গা, ষষ্ঠী, কালী, শিব, ভোলানাথ) ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় বর্ণপ্রথা ও জাতিভেদপ্রথার যে আমূল পরিবর্তন ইত্যাদি আলোচনার মাধ্যমে সংস্কৃতির দিকটি লেখক উন্মোচিত করেছেন। ফলস্বরূপ গণদেবতা এক ঐতিহাসিক গ্রন্থে পরিণত হয়েছে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গণদেবতা উপন্যাসে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির কথা সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। একজন হিন্দু-সাহিত্যিকের জীবনে হিন্দু সংস্কৃতির অভিজ্ঞতা থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু বিজাতীয় সংস্কৃতির সৌন্দর্য্য গ্রহণ করার জন্য চাই এক উদার দৃষ্টিভঙ্গি। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তার অধিকারী ছিলেন। তিনি জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষকে সমগুরুত্ব দিয়ে সাহিত্যে স্থান দিয়েছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষের মত তিনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি না নিয়ে সমতাভরা দৃষ্টিতে তাদের সমগ্র জীবন রূপ দেখার চেষ্টা করেছেন এই সূত্র ধরে এসেছে "মনু মিঞা, খালেক সায়েব, গোলাম মেজ্জা"[১২] প্রমুখের নাম। এখানে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় একজন সাহিত্যিক হয়েও একজন ধর্মনিরপেক্ষ ও উদার মনোভাবাপন্ন ঐতিহাসিকের ভূমিকা পালন করেছেন।

গণদেবতা উপন্যাসে সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি আলোচিত হবার পাশাপাশি গ্রামীণ বাংলার পরিবেশের দিকটি আলোচিত হয়েছে। মেঘ মেদুর আকাশ, মুক্ত বাতাস, বৃষ্টি, ঝড়-ঝঞ্ঝাট, বৈশাখের দ্বিপ্রহর, দিগন্ত বিস্ফারিত খাঁ খাঁ মাঠ, ময়ুরাক্ষীর বন্যায় প্লাবিত শস্যক্ষেত, বর্ষার সজল ঘন মেঘ, মাটির সোদা গন্ধ, বেনা ঘাস থেকে বিচিত্র বৃক্ষ-বৃক্ষাদি, ইত্যাদি আলোচনার মাধ্যমে পরিবেশ কে উপন্যাসে ঠাঁই দিয়ে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় একজন পরিবেশবাদী ঐতিহাসিক (Environmental Historian) রূপে আবির্ভূত হয়েছেন।

আধুনিক ইতিহাস রচনার উপাদান হিসাবে (Oral source) বা মৌখিক উপাদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু উল্লেখ্য আজ থেকে প্রায় পঁচাত্তর বছর পূর্বে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় গণদেবতা উপন্যাস রচনায় মৌখিক উপাদান কে মৌল উপাদান রূপে

ব্যবহার করেছেন। লেখকের ভাষায়- "শিবতলার ব্যাপারটা ভৌতিক ব্যাপার। কোন পুত্রহারা কোন শোকার্ত মায়ের অবিরাম কান্নায় বিচলিত হইয়া নাকি তাহার মৃত পুত্রের পেতাত্মা নিত্য সন্ধ্যায় মায়ের কাছে আসিয়া থাকে। অন্ধকার ঘরের মধ্যে তাঁহার মা খাবার রাখিয়া দেয়, আসন পাতিয়া রাখে, পেতাত্মা আসিয়া সেই ঘরে বসিয়া মায়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলে। সেই অবসরে নানা স্থান হইতে লোকজন আসিয়া আপন আপন রোগ দুঃখ অভাব অভিযোগ পেতাত্মার কাছে নিবেদন করে। পেতাত্মা সেসবের প্রতিকারের উপায় করিয়া দেয়।"[১৩]

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারত ইতিহাসে শরীরচর্চা ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্পর্কে যে নবচেতনার জাগ্রত হয়েছিল তার বিস্তিতঃ বিবরণ আছে গণদেবতা উপন্যাসে। সুস্থস্বাস্থ্য এবং শরীর চর্চার জন্য সমসাময়িক কালে কুসুমপুর, আলেপুরে কৃষকদের মধ্যে কুস্তিলড়াই কে চলিত ভাষায় আমুতির লড়াই বলা হত – তারাশঙ্করের ভাষায় "আমুতির লড়াই হিন্দু-মুসলিম দুই সম্প্রদায়েরই সমারোহের বস্ত। চাষের পূর্বে চাষীরা বোধ হয় শক্তি পরীক্ষা করে"[১৪] এর পাশাপাশী পানীয় জলের সংস্থান, পুষ্করিনী পরিষ্কার, কুয়ো খনন, প্রজার স্বাস্থ্য সম্পর্কে জমিদারের দায়িত্ব ও কর্তব্য ইত্যাদি আলোচনা করে লেখক আধুনিক ইতিহাস চর্চাকে সার্বভৌম রূপ দান করেছেন।

আধুনিক কালে গণশক্তি, জনগন, গণতন্ত্র এই কথাগুলির মধ্যে রাজনৈতিক ব্যঞ্জনা আছে। কিন্তু তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 'গণদেবতা' বলতে যা বুঝিয়েছেন তা হল সামাজিক প্রতিষ্ঠান। গণদেবতা'য় তিনি দেখিয়েছেন চণ্ডীমণ্ডপকে আশ্রয় করে ব্যক্তিজীবন গোষ্ঠীজীবনে পরিণত হয়েছে। চণ্ডীমণ্ডপ আশ্রিত গোষ্ঠী জীবন এবং গোষ্ঠীজীবনের বিলয়, উগ্র ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের উদ্ভব, শহর কেন্দ্রীক নতুন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব। গ্রামীনের অর্থনীতির পরিবর্তে শিল্প ভিত্তিক অর্থনীতির প্রাধান্য বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাঙালী জীবনের যুগান্তরের এক ইতিহাস ধরা পড়েছে গণদেবতা পরিকল্পনায়। এই বিচারে গণদেবতা "ভারতবর্ষের গ্রাম্য সমাজের সামাজিক অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ইতিহাসের ভাষ্য"[১৫] এবং "গণদেবতা এই রাঢ়ের মহাকাব্য"[১৬] বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাঙালীর জীবন সোজাও নয়, বাঁকাও নয়, ত্রিভূজাকৃতি। রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজ এই ত্রিভূজের তিনটি বাহু। গণদেবতা উপন্যাসে অধিকাংশ চরিত্র ত্রিভূজাকৃতি। এখানে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাস চেতনার লক্ষণ প্রমাণিত।

একথা প্রমাণিত সত্য তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বিংশ শতাব্দীর এক চিন্তাশীল ইতিহাস বোধ সম্পন্ন লেখক, তিনি প্রাচীন ইতিহাসের কোন ঘটনার গর্ভে প্রবেশ করে গণদেবতা উপন্যাসটি লেখেননি। তিনি তাঁর সম-সাময়িক কালের মধ্যে ইতিহাসের পদশব্দ শুনতে পেয়েছেন এবং তা রচনার মাধ্যমে স্থায়ী করে রেখেছেন। তাই, বর্তমান কালে কেবল সাহিত্যের ইতিহাস লেখক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্মরণ করবেন না। যে সকল আধুনিক ঐতিহাসিকেরা বিংশ শতাব্দীর বাঙালীর আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইতিহাস লিখবেন তাহারা প্রত্যেকেই তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্মরণ করবেন সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

তথ্যসূত্র

১. তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, (সম্পাদিত), পশ্চিমবঙ্গ : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা ১৪০৪, বসুমতি কর্পোরেশন লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা- ৩৯

২. প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা-২১৪

৩. প্রাগুক্ত – পৃষ্ঠা- ২১৪

৪. ভীষ্মদেব চৌধুরী, (সম্পাদক), তারাশঙ্কর স্মারকগ্রন্থ, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০১, পৃষ্ঠা- ১৪২

৫. রণেশ রায়, ঔপনিবেশিক ভারতের রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০১, পৃষ্ঠা- ৭

৬. প্রিয়দর্শী চক্রবর্তী, (সম্পাদনা), ইতিহাস ও সাহিত্য : মুখোমুখি আয়নায়, আশাদীপ, কলকাতা, ২০১৩, পৃষ্ঠা- ৭৭

৭. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর রচনাবলী, (তৃতীয় খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা- ১৪০

৮. সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, ভারতের ইতিহাস ও ঐতিহাসিক:, প্রাচীন মধ্য ও আধুনিককার, মিত্রম, কলকাতা, ২০০৫, পৃষ্ঠা- ৭

৯. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর রচনাবলী, (তৃতীয় খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা- ২৭০-২৭১
১০. গৌতম ভদ্র, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, (সম্পাদনা), নিম্নবর্গের ইতিহাস, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা- ৪১
১১. প্রিয়দর্শী চক্রবর্তী, (সম্পাদনা), ইতিহাস ও সাহিত্য : মুখোমুখি আয়নায়, আশাদীপ, কলকাতা, ২০১৩, পৃষ্ঠা- ৬৭
১২. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর রচনাবলী, (তৃতীয় খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা- ২৬৭
১৩. প্রাগুক্ত – পৃষ্ঠা- ২১০
১৪. প্রাগুক্ত – পৃষ্ঠা- ৩৬১
১৫. প্রিয়দর্শী চক্রবর্তী, (সম্পাদনা), ইতিহাস ও সাহিত্য : মুখোমুখি আয়নায়, আশাদীপ, কলকাতা, ২০১৩, পৃষ্ঠা- ৬৮
১৬. প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা- ৬৮

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১. Michael Stanford, The Nature of Historical Knowledge, Basil Blackwell Ltd., Newyork, 1986.
২. E.H. Carr, What is History, Palgrove Macmillan, London, 1961.
৩. E. Sreedharan, A Textbook of Historiography : 500 BC to AD 2000, Orient Longman, New Delhi, 2004.
৪. S.K. Mukhopadhyay, Evolution of Historiography in Modern India 1901-1960 : A Study of the writing of Indian History by her Own Historians, Progressive Publishers, Kolkata, 1981.
৫. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর রচনাবলী, (তৃতীয় খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ
৬. গৌতমভদ্র, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, (সম্পাদনা), নিম্নবর্গের ইতিহাস, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৮।
৭. সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, ভারতের ইতিহাস ও ঐতিহাসিক; প্রাচীন মধ্য ও আধুনিককাল, মিত্রম, কলকাতা, ২০০৫।
৮. প্রিয়দর্শিনী চক্রবর্তী, (সম্পাদক), ইতিহাস ও সাহিত্য: মুখোমুখি আয়নায়, আশাদীপ, কলকাতা, ২০১৩।
৯. ভীষ্মদেব চৌধুরী, (সম্পাদনা), তারাশঙ্কর স্মারকগ্রন্থ, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০১।
১০. রণেশ রায়, ঔপনিবেশিক ভারতের রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০১।
১১. তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, (সম্পাদিত), পশ্চিমবঙ্গ : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা ১৪০৪, বসুমতি কর্পোরেশন লিমিটেড, কলকাতা- ১৯৯৭।